OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 45*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 423*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 412 - 423*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848*

# রঙের জাদুতে জীবন্ত কাহিনী : অস্তিত্ব সংকটে থাকা ঝাড়খণ্ডের পটশিল্প ও পটুয়া গীত

অমৃত মণ্ডল
ডক্টরাল রিসার্চ স্কলার, বাংলা বিভাগ
সোনা দেবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঘাটশিলা, ঝাড়খণ্ড
Email ID: amritmandal701@gmail.com
iD 0009-0005-6162-1585
ও
ড. প্রিয়ঞ্জনা ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সোনা দেবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঘাটশিলা, ঝাড়খণ্ড
Email ID: Banerjee.priyanjana1993@gmail.com

***Received Date*** *15. 06. 2026*
***Selection Date*** *15. 07. 2026*

***Keyword***
*Patachitra art, patua songs, Jharkhand, folk art, cultural crisis, tribal society, regional folk culture, heritage preservation.*

***Abstract***
*The Patachitra art and Patua songs of Jharkhand represent a unique tradition of Indian folk art, where the harmonious fusion of colour, art, voice, and melody create vivid narrative expressions. The artistic practice of the Patua community traditionally combined storytelling, painting, and singing. For centuries, the patuas of Jharkhand travelled from village to village, narrating moral and mythological tales through songs while illustrating them with scroll paintings known as Patachitra. The songs performed alongside these painted scrolls are popularly known as Pater Gaan or Patua songs. This integrated artistic tradition has long served as an important medium of education, religious belief, entertainment, moral instruction, and social awareness within tribal and rural societies. However, rapid urbanisation, the expansion of digital media, and the socio-economic marginalisation of artists have placed this folk tradition under severe threat. A further challenge is the lack of adequate scholarly research on the Patua community in Jharkhand, resulting in insufficient documentation of their artistic heritage, social identity, cultural practices, and contemporary struggles. The present study explores the significance of Patachitra art, its regional variations, and the challenges it faces in the contemporary period. It also highlights the role of preservation initiatives, such as government support, exhibitions, and community-based efforts, in sustaining this endangered cultural tradition. Therefore, the Patachitra art and Patua songs of Jharkhand are not merely artistic*

*expressions; they constitute a living history painted in colours, reflecting human emotions, hidden social narratives, and the broader spirit of folk culture. Preserving this heritage is essential for safeguarding an invaluable cultural legacy for future generations.*

**Discussion**

**ভূমিকা :**

"সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাইরের দেশে কালে,
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।"
- রবীন্দ্রনাথ

পটশিল্প ও পটুয়া গীত ভারতীয় লোকশিল্পের এক অনন্য ঐতিহ্য-যেখানে রঙ, রেখা, শব্দ ও সুরের মেলবন্ধনে জন্ম নেয় জীবন্ত কাহিনী। তাঁদের শিল্প ছিল গল্প বলা, চিত্রাঙ্কন ও গান[১] (চিত্র ১)। মানবিক প্রয়োজন থেকেই লোকসঙ্গীতের জন্ম ও বিকাশ ঘটেছে। আনন্দ কিংবা বেদনা, প্রেম অথবা অপ্রেম— যে অনুভূতিই হোক না কেন, মানুষ শুধুমাত্র নিস্তরঙ্গ শব্দে তার হৃদয়ের গভীর অভিব্যক্তি প্রকাশে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি; সেই অনুভূতিকে অমল সুরের স্রোতে প্রাণময় রূপও দিয়েছে।

লোকসঙ্গীতের ধারাটি সম্পূর্ণ মৌখিক। যুগের পর যুগ ধরে এটি নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মুখে-মুখে প্রচারিত হয়েছে এবং সেইভাবেই তার অস্তিত্ব টিকে আছে। প্রাচীনযুগের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন না থাকায় তারা রচিত গান চিরকালের মতো লিখে রাখতে সক্ষম ছিল না। সম্ভবত এই কারণেই খাঁটি লোকগীতি সাধারণত দুই-চারটি পঙ্ক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। লোকগীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর সজীবতা। এই গুণের কারণেই লোকগীতি যুগান্তরের হলেও সর্বদা নবীন মনে হয়। এ প্রসঙ্গে এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেছেন –

> "Indeed, a folksong is neither new nor old; it is like a forest tree with roots deeply buried in the past but which continuously puts forth new branches, new leaves, new fruits."[২]

**চিত্র ১ :** পটচিত্রী হরগৌরী চিত্রকর ও গণেশ চিত্রকর।

**পটশিল্প ও পটুয়া গীত-ঝাড়খণ্ডের অনন্য লোকশিল্প ঐতিহ্য :** ভারতের বহুমাত্রিক দৃশ্যশিল্পের ধারায় পটচিত্র ও পটুয়া গীতের অবস্থান সত্যিই স্বতন্ত্র— যেখানে চিত্র, গান ও রং একত্রিত করে এমন এক জীবন্ত কাহিনির সৃষ্টি করে, যা যুগ যুগ

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 423
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ধরে গ্রামীণ সমাজচেতনা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ‘পট’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘পট্ট’ শব্দ থেকে, যার অর্থ কাপড় বা বস্ত্র। সাধারণভাবে পট বলতে কাপড় বা কাগজে বিশেষ ভঙ্গিতে আঁকা ছবি বা চিত্রমালাকে বোঝানো হয়।[৩] লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, অতীতে পট আঁকা হত চটের উপর। চটের যে দিকটিতে ছবি আঁকা হত, সেটিকে প্রথমে কাদা ও গোবর মিশিয়ে মসৃণ করা হতো। শুকিয়ে গেলে তাতে আঁকা হতো বিভিন্ন ছবি। পরে চটের বদলে কাপড় বা তুলট কাগজ ব্যবহার করা শুরু হয়।[৪]

পটুয়া হলেন সেই শিল্পী যিনি পট আঁকেন এবং পটের গান গেয়ে গল্প শোনান। ‘পট’ শব্দের সঙ্গে ‘উয়া’ প্রত্যয় যোগ হয়ে ‘পটুয়া’ শব্দটির সৃষ্টি। পটশিল্পের সঙ্গে বিশেষ কিছু জাতিগোষ্ঠীর মানুষ জড়িয়ে আছেন। তাদেরকে নানা অঞ্চলে ‘পটকা’, ‘পট্টকার’, ‘পাইটকা’, ‘পোটো’, ‘পটুয়া’ বা ‘চিত্রকর’ নামে ডাকা হয়। এরা গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে পট দেখান, গান গেয়ে গল্প পরিবেশনের মাধ্যমে মানুষের কাছে নৈতিক শিক্ষা, পৌরাণিক আখ্যান, সামাজিক বার্তা ও ইতিহাস পৌঁছে দেন এবং নিজের জীবিকা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করেন।[৫] একটি প্রচলিত কাহিনিতে বলা হয়, পটুয়ারা বিশ্বকর্মার বংশধর। কিন্তু গল্প অনুযায়ী, এক পটুয়া দেবাদিদেব মহাদেবের অনুমতি না নিয়েই তাঁর ছবি আঁকেন। পরে বিষয়টি লুকোতে তিনি তুলি মুখে চেপে লুকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু মহাদেব তা দেখে ফেলেন। তুলি নোংরা করার অপরাধে মহাদেব রাগ করে তাঁকে অভিশাপ দেন, আবার দেখা যায় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের দশম অধ্যায়ে পটুয়া বা চিত্রকর জাতির জন্ম নিয়ে আরেকটি গল্প পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে— ব্রাহ্মণের রূপে থাকা বিশ্বকর্মা এবং গোপবংশের মেয়ে ও অপ্সরা ঘৃতাচীর মিলনে নয়টি পুত্র জন্মেছিলেন। এই নয়জন হলেন— মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, তন্ত্রবায় (কুন্দিবক), কুমোর, কাঁসাকর, সূত্রধর, চিত্রকর এবং স্বর্ণকার। এর মধ্যে চিত্রকরই পটুয়ার পূর্বপুরুষ বলে ধরা হয়। আর সেখান থেকেই তাঁদের জাতিগত পতন ঘটে।[৬] পটুয়াদের জীবন-যাপনও যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁরা পুরোপুরি হিন্দু নন, আবার সম্পূর্ণ মুসলমানও নন; বরং উভয় ধর্মীয় সংস্কৃতির এক স্বতন্ত্র সমন্বয়ে গঠিত এক অনন্য মেলবন্ধন। তাঁদের নামের মধ্যে যেমন হিন্দু ও মুসলমান-দুই ধারার প্রভাব লক্ষ করা যায়, তেমনি তাঁদের দৈনন্দিন জীবনাচরণেও এই দ্বৈত সত্তার প্রকাশ ঘটে। কখনও তাঁরা ‘রাম’-এর ভক্ত, আবার কখনও ‘রহিম’-এর অনুসারী। তাঁরা মুসলিম সমাজের নিয়ম অনুযায়ী নামাজ পড়ে, একই সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর ছবি স্থাপন করে পূজা করেন এবং মূর্তিও নির্মাণ করেন। তাঁদের সমাজে বিবাহিত নারীরা হিন্দু প্রথা অনুযায়ী শাঁখা-সিঁদুর পরেন, আর পুরুষ পটুয়ারা তাঁদের স্ত্রীকে ‘বিবি’ বলে সম্বোধন করেন। লোককথায় এভাবেই তাঁদের স্বাতন্ত্র্যময় পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।[৭]

**ঐতিহাসিক পটভূমি :** ঝাড়খণ্ডের পটশিল্প ও পটুয়া গীতের ইতিহাস ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন চিত্র ও মৌখিক বর্ণনার ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই শিল্পরীতির উৎপত্তি মূলত সেই সময়ে, যখন লিখিত সাহিত্য সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল এবং মৌখিক ও দৃশ্যভিত্তিক মাধ্যমই ছিল জ্ঞান ও তথ্য আদান-প্রদানের প্রধান উপায়। পটশিল্প সেই ঐতিহ্যেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ, যেখানে চিত্র ও সংগীতের মাধ্যমে কাহিনী পরিবেশন করা হত।

ঐতিহাসিকভাবে পটশিল্পের শিকড় প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে সম্পর্কিত। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রচারকরা যেমন চিত্র ও কাহিনির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মীয় বার্তা পৌঁছে দিতেন, তেমনি পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মীয় কাহিনি— বিশেষত *রামায়ণ, মহাভারত,* এবং *মনসামঙ্গল—* পটচিত্রের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। এই ধারাটি মধ্যযুগে আরও বিস্তৃত হয়, যখন ভ্রাম্যমাণ শিল্পীরা গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে পটচিত্র প্রদর্শন এবং গানের মাধ্যমে কাহিনী পরিবেশন করতেন।

ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে পটশিল্পের একটি স্বতন্ত্র রূপ গড়ে ওঠে, যা ‘পৈটকার’ নামে পরিচিত। পূর্ব সিংভূম ও সংলগ্ন অঞ্চলে এই পৈটকার শিল্পের বিকাশ ঘটে, যেখানে স্থানীয় আদিবাসী সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং জীবনযাত্রার প্রতিফলন দেখা যায়। এখানে পটচিত্রে শুধু পৌরাণিক কাহিনি নয়, বরং উপজাতীয় দেবদেবী, লোকবিশ্বাস এবং সামাজিক ঘটনাও চিত্রিত হয় (চিত্র ২)। পটুয়া বা চিত্রকর সম্প্রদায় ঐতিহ্যগতভাবে এই শিল্পের ধারক ও বাহক। তারা একাধারে শিল্পী, গায়ক এবং কাহিনিকার। তাঁদের পরিবেশনার ধরন ছিল অত্যন্ত নাটকীয়-পট খুলে খুলে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা গান গেয়ে কাহিনী

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 45*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 423*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

বর্ণনা করতেন। এই দ্বৈত উপস্থাপনা পটশিল্পকে কেবল একটি চিত্রকলার ধারা না রেখে একটি পারফরমেটিভ লোকশিল্পে পরিণত করেছে।

**চিত্র ২:** দেব-দেবীর পট, পটচিত্রী হরগৌরী চিত্রকর ও গণেশ চিত্রকর অঙ্কিত।

ঔপনিবেশিক সময়ে এই শিল্পরীতির উপর কিছুটা প্রভাব পড়ে। ব্রিটিশ শাসনকালে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা ও মুদ্রণ প্রযুক্তির বিকাশের ফলে পটশিল্পের গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পায়। তবে একই সময়ে ইউরোপীয় পর্যটক ও গবেষকদের আগ্রহে এই শিল্প আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করে।

স্বাধীনতার পরেও পটশিল্প গ্রামীণ সমাজে টিকে থাকলেও ধীরে ধীরে এর জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে টেলিভিশন, সিনেমা এবং ডিজিটাল মাধ্যমের প্রসারের ফলে এই শিল্পরীতি নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। তবুও, পটুয়া সম্প্রদায় তাঁদের ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং সমসাময়িক বিষয়বস্তু যুক্ত করে শিল্পকে প্রাসঙ্গিক রাখার চেষ্টা করেছেন।

সুতরাং, ঝাড়খণ্ডের পটশিল্প ও পটুয়া গীতের ঐতিহাসিক বিবর্তন একটি দীর্ঘ সাংস্কৃতিক যাত্রার ফল—যেখানে প্রাচীন ধর্মীয় প্রচার থেকে শুরু করে আধুনিক সামাজিক বাস্তবতা পর্যন্ত নানা স্তরের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই ঐতিহ্য কেবল একটি শিল্পধারা নয়, বরং এটি একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক নথি, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হলেও তার মূল বৈশিষ্ট্য অটুট রেখেছে।

**উপকরণ, প্রস্তুতপ্রণালী ও কৌশল :** পট শিল্পীরা উদ্ভিদ ও খনিজজাত প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরি জলভিত্তিক রঙ ব্যবহার করে তাঁদের স্ক্রোলচিত্র নির্মাণ করেন।

**স্ক্রোল প্রস্তুত :** হাতের তৈরী কাগজ বা কাপড়ের উপর তেঁতুল বিচির আঠা, চালের মাড় ও চকগুঁড়ো প্রয়োগ করে স্ক্রোল তৈরি হয়। প্রলেপ শুকানোর পর মসৃণ পাথরে ঘষে চকচকে করা হয়। প্রয়োজন মতো একাধিক কাগজ জোড়া দিয়ে দীর্ঘ স্ক্রোল বানানো হয়। স্ক্রোলের দুই প্রান্তে বাঁশের রোলার লাগানো থাকে এবং একটি দড়ি দিয়ে সেটি বাঁধা হয়। সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য অনেক সময় পিছনে পুরনো শাড়ি লাগানো হয়।

**তুলি ও আঁকার ধরন :** প্রথাগতভাবে কাঠবিড়ালি বা ছাগলের লোম দিয়ে তৈরি তুলির সাহায্যে আঁকা হত। পটুয়ারা প্রথমে পেন্সিল দিয়ে আঁকেন এবং পরে রঙ ভরা হয় ও কালো রেখায় পুনরায় অলঙ্করণ করা হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 423
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

**বিন্যাস :** প্রতিটি স্ক্রোল ধারাবাহিক খণ্ডে বিভক্ত। উপরে দেবী-দেবতার জগত, নিচে মানবজগত বা পাতালচিত্র। জ্যামিতিক মোটিফ ও অলঙ্করণ স্ক্রোলকে সঙ্ঘবদ্ধ করে (চিত্র ৩)।

**চিত্র ৩:** পটচিত্রী হরগৌরী চিত্রকর ও গণেশ চিত্রকরের অঙ্কিত পট।

**রঙ :** পটুয়া শিল্পীরা প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করেন। গাছের ফল, পাতা, হাঁড়ির কালি, পাথর— এসবই তাদের রঙের মূল উপাদান। মুড়ি ভাজার তাওয়া, প্রদীপের কালি বা খোলার পেছনের কালো ভুষি থেকে তারা তৈরি করে কালো রঙ। হলুদের সঙ্গে চুন মিশিয়ে লাল, বেলের আঠা ও হরিতাল দিয়ে হলুদ, কমলা রঙ পলাশ ফুল থেকে, শিমপাতা বা ডালের পাতা থেকে তৈরি করা হয় সবুজ রং, আর নীল তৈরি হয় নীল বা ইন্ডিগো থেকে।

**রঙ প্রস্তুত প্রণালী :** পাতা বা ফুল ভালোভাবে বেটে পেস্ট তৈরি করা হয়, তারপর সেই পেস্ট চিপে রস বের করে নিয়ে ঘন করার জন্য সেদ্ধ করা হয়। রঙকে টেকসই ও উজ্জ্বল করতে বাবলা গাছের আঠা মেশানো হয়। দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুত রঙ নারকেলের খোলের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। এইভাবে প্রকৃতির রঙে গড়ে ওঠে পটুয়া শিল্পের অনন্য রূপ।

**পটুয়া গীতের বিষয় :** ঝাড়খণ্ডের পট শিল্পীদের চিত্রকলার বিষয়বস্তু সাধারণত কয়েকটি প্রধান ধারায় বিভক্ত-সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মেলা, উৎসব, পুরাণভিত্তিক কাহিনি এবং সামাজিক জীবনের নানাদিক। রামায়ণ ও মহাভারতসহ প্রাচীন হিন্দু মহাকাব্য, জনপ্রিয় কিংবদন্তি ও লোককথা। পরলোক বা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের গল্প-যেমন যম পট, মৃত্যু পট ইত্যাদি।

**সামাজিক বার্তা :** - উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষরা মূলধারার সমাজ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন ও অবহেলিত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের সঙ্গীত ও শিল্পকলার মধ্যদিয়ে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিল। একসময় পটুয়া সম্প্রদায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে পট দেখিয়ে ও পটের গান শোনিয়ে সাধারণ মানুষকে সত্য - নিষ্ঠা, নীতি ও আদর্শের পথ চিনিয়ে দিত। অন্যায়ের পথ থেকে দূরে সরিয়ে সৎ জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনাই ছিল তাদের প্রধান ভূমিকা। মানুষের জীবনের অন্ধকার ময় দিকগুলো তুলে ধরে তাদের সৎ ও আলোর পথে চালিত করতে, ন্যায়–অন্যায়, পাপ–পুণ্য ও ভাল–মন্দের বোধ জাগিয়ে তুলতে একসময় পট ও পটুয়াই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম (চিত্র ৪)।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 423
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

**চিত্র ৪ :** পটচিত্রে শাস্তির বিধানকে চিত্রিত করা হয়েছে।

পটুয়াদের গানে প্রায়ই অন্যায়ের শাস্তির কথা তুলে ধরা হত, আর পটচিত্রে তার প্রতীকী রূপ ফুটে উঠত— যা দেখে বহু মানুষ ভয় পেয়ে ভুল পথ ছেড়ে সৎ পথে চলার চেষ্টা করত। স্বামী নিন্দা, ব্যভিচার, মিথ্যাচার, সুদখোরি— এইসব দোষ মানুষের জীবনকে কী ভাবে পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়, তারই চিত্র ও বর্ণনা ফুটে উঠত পটুয়াদের ছবি আর গানে। একই সঙ্গে তারা দেখাতেন কীভাবে  পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়— আর সেই মুক্তির উপায় ছিল দান, ধ্যান, ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা।

(১) যা খাবেন যা বিলাবেন এই তো ভবে সার,
হরিনামে ধরা থাকবে হবে বৈকুণ্ঠ পার।
হরি হরি বলরে ভাই ঠাকুর জগন্নাথ,
যাঁর নাম নইলে খণ্ডন যাবে না পাপ।
গোয়ালা রথ টানো ভাই বদনে বল হরি,
এইবার উদ্ধার ক'রে দাও যাব বৈকুণ্ঠপুরী।
জগন্নাথের পথে যেতে নেউড় বাঁশের কাঁটা,
কুবিরের তোড়ানি খাবেন হাড়ির খাবেন ঝাঁটা।
জয়-জগন্নাথ মহাপ্রভু শুনিবার কাহিনি,
ডানদিকে বলরাম মধ্যিখানে রয়েছেন সুভদ্রা ভগিনী।
জগন্নাথ-পুরীতে গো এক হাঁড়িতে জ্বাল দিলে
পরে সাত হাঁড়িতে ভাত হয়,
সেই ভাত দেখুন কিন্তু সর্বলোকে খায়।
ভাই বলো বন্ধু বলো সম্পত্তির ভাগী
বিপদকালে তরাবেন সেই গোবিন্দ-সারথি।[৮]

(২) এক পাপী ছিল নারী হত্যা করেছিল।
তার আয়ু যখন শেষ হয়ে গেল।
যমদূত আসিয়া শিকল দিয়া হাত পা বাঁধিয়া।
যমপুরীতে টেনে নিয়ে গেল।
যমরাজা তাকে শাস্তির হুকুম দিল।
কড়ায়ের গরম তেলে হাত ঢুকিয়ে দিল ।।

OPEN ACCESS
IF 8.111

যমরাজা আর জীবাত্মা জন্মদাতার কাছে নিয়ে দিল।
জন্মদাতা খাতা দেখে বলে তুমি মহাপাপী।
তুমি জন্ম লিবে পাঠা ছাগল হয়ে।
সাতবার জন্ম লিবে সাতবার বলি হবে।
এই জন্ম দিল বিধাতায় তারে।[৯]

(৩) আর এক বউ ছিল বড়ই চণ্ডাল।
ভাট-ভিখারীকে কভু ভিক্ষা নাহি দিত।।
দূর দূর করিয়া খেদাইয়া দিত।
তার আয়ু যখন শেষ হয়ে গেল।
যমদূত আসিয়া গলায় শিকল দিয়া
যমপুরীতে টেনে নিয়ে গেল।
যমরাজা শাস্তির হুকুম দিল।[১০]
পায়ে শিকল দিয়া গরম বালিতে তাকে টানাটানি করে।
যমরাজা খাতা খুলে দেখে তুমার কিছু জমা নাই, শূন্য।
তুমি দালান ঘরে ছিলে এবার তুমার জন্ম হবে কুড়ে ঘরে
খেতে নাই পাবে।

(৪) কালো কালো যমরাজা কুঁচ বরণ আঁখি।
জন্ম-মৃত্যুর পাঁজি দেখেন, ধর্ম রাখেন সাক্ষি।।
যখন যার আয়ু শেষ হয়ে যায়।
তার পুরীতে আনিবারে দূত পাঠায়।।
পাপী যদি হয় সে, শিকলে হাত পা বেঁধে
টেনে আনে তাকে।।
আর ধার্মিক যদি হয় সে।
রথে চাপিয়ে আনে তাকে।।
পাপীগণকে সাজা দেয় 'ধার্মিকের নয়।।[১১]

**পৌরাণিক :** ঝাড়খণ্ডে কেতকাদাসের রচিত মনসামঙ্গল একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। মনসা পূজার সময় গ্রামে গ্রামে এই পুঁথি গীত আকারে পরিবেশিত হয়। মনসা পূজা এখানে প্রায় ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হওয়ায় মনসামঙ্গল গানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। পটশিল্পের ক্ষেত্রেও মনসামঙ্গল গীতই সর্বাধিক প্রচলিত বিষয়। ঝাড়খণ্ডের পাটুয়া সম্প্রদায়ের প্রধান আরাধ্য দেবী হলেন মা মনসা, যিনি বিষহরি নামে পরিচিত। সেই কারণে মনসা পটের গান পাটুয়া শিল্পীদের পরিবেশনে বিশেষ গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মনসা পটের গান—

(১) ওরে পদ্ম বনে জন্ম আমার নাম পদ্মা বতি
পূজার লাগিয়ে এলাম - এলাম মর্ত্তভূমি।
শিবকণ্ঠ হইতে বিষ উগারিয়া ছিল
সেই হইতে বিষ হরি নাম মোর হইল।

(২) ওগো শোনো পিতা ত্রিলোচন করি নিবেদন।
সিজুয়া নিবাসী মোরে কৈলে অকারণ।

(৩) আমি থাকিতে না পারি পিতা সিজুয়া শিখরে।
চাঁদ আমায় গালি দেয় চেং মুড়ি বলে।

(৪) ওরে মোহ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আমায় না চিনিলি।
শিবের দেওয়া মহাঙ্গান দূরে ফেলে দিলি।

(৫) ওরে সুন্দরী নয়, রূপসী নয় মিছে কর আসা।
পদ্ম বনে জন্ম আমার নাম টি মনসা।[১২]

**আঞ্চলিক বৈচিত্র্য :** সাঁওতাল পরগনা, দুমকা, দেবঘর, গিরিডি, হজরিবাগ, গড্ডা, পাকুড় - প্রতিটি অঞ্চলে পটচিত্র ও পটুয়া গানের আঙ্গিকে দেখা যায় নিজস্ব সামাজিক আচার, লোকবিশ্বাস, উপভাষা, নৃত্য-গীত এবং আদিবাসী সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাব। সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে করম, সোহরাই, বাঘুয়ার শিকার, মহাপৃথিবী বা মারাং-বুরু বা জাহেরের মতো আদিবাসী দেবতা ও তান্ত্রিক কাহিনি প্রতিফলিত হয়।[১৩] দুমকা ও দেবঘরে পটুয়ারা তাঁদের পটে স্থানীয় লোককথা, কৃষিজীবন, বর্ষার উৎসব এবং ঋতুচক্রের দৃশ্যকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। গানের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সুস্পষ্ট-কোথাও সাঁওতালি বা কুড়ুখ উপভাষার সংমিশ্রণ, কোথাও ঝুমুর, ছৌ, দাহির বা লোক-ধামসার ছন্দ; আবার কোথাও বাঙালি কীর্তন বা মঙ্গলকাব্যের ধারা। ফলে একই শিল্পরীতি ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভাষা, স্বরক্ষেপণ, তালের ভঙ্গি, অলঙ্কার ও প্রেক্ষাপটে নতুন রূপ ধারণ করেছে।এইভাবে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত পটশিল্প ও পটুয়া গীত কেবল রঙ ও সুরের শিল্প নয় - এটি প্রতিটি অঞ্চলের সামাজিক স্মৃতি, আঞ্চলিক পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক বহুত্বের জীবন্ত দলিল।[১৪]

**পট শিল্পীদের বর্তমান অবস্থা :** - শিল্পীরা আজ নানান দৈনন্দিন সংকটের মুখোমুখি। তাঁদের প্রধান সমস্যা হল শিল্পপণ্যের পর্যাপ্ত বাজার না থাকা। ক্রেতার অভাবে শিল্পীরা স্থায়ী ও সুরক্ষিত জীবিকা অর্জন করতে পারেন না। ফলে আগামী প্রজন্মও এই শিল্পচর্চায় আগ্রহ হারাচ্ছে। পূর্বপুরুষদের মতো শুধু ঐতিহ্যগত পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীরা আর বাঁচতে পারছেন না-এটাই এই সংকটের মূল কারণ।

**পূর্ব সিংভূম জেলার আমডুবি গ্রামের বাস্তব চিত্র :** আমাডুবি গ্রাম পট শিল্পের জন্য বিখ্যাত হলেও বর্তমানে মাত্র ৭-৮ জন শিল্পী নিয়মিতভাবে এই চিত্রশিল্প চর্চা করছেন। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ এই শিল্প সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেও আর্থিক অনিশ্চয়তার কারণে অধিকাংশ পরিবারই বহুদিন আগে পট আঁকা ছেড়ে দিয়েছে। তাঁদের অনেকেই জীবিকার তাগিদে এখন কাঠমিস্ত্রি, প্রতিমাশিল্প, দর্জির কাজ, কৃষিশ্রমিক বা ছোটখাটো মেরামতির কাজে নিযুক্ত।

পট শিল্পের সাংস্কৃতিক মূল্য উপলব্ধি করে ঝাড়খণ্ড সরকার ২০১৩ সালে আমাডুবিকে গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করে। ঝারক্র্যাফট এবং ঝাড়খণ্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (JTDC)-এর সহযোগিতায় পর্যটন কটেজ এবং একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাতে বিশেষ করে শিশুদের পট শিল্পে শিক্ষিত করা যায়। কিন্তু বর্তমানে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় শিল্পচর্চার ধারাবাহিকতা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

**দুমকা জেলার বাস্তব চিত্র :** দুমকা অঞ্চলে পট শিল্পীদের অবস্থাও একই রকম সংকটপূর্ণ। পর্যাপ্ত ক্রেতার অভাব এবং আর্থিক অনিশ্চয়তা তাঁদের শিল্পচর্চাকে টিকিয়ে রাখাকে কঠিন করে তুলেছে। ফলে নতুন প্রজন্ম এই শিল্পে যুক্ত হতে আগ্রহী নয় এবং শিল্পধারা দ্রুত অবক্ষয় হচ্ছে।

বর্তমানে গোটা দুমকা অঞ্চলে হাতে-গোনা কয়েকজন ঐতিহ্যবাহী পট শিল্পী সক্রিয় রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গণপতি চিত্রকার, নিতাই চিত্রকার, এবং দেওধন চিত্রকার - এই তিনজন (নওসার গ্রাম, মসলাইয়া ব্লক) সবচেয়ে পরিচিত ও ঐতিহ্যবাহী ধারার উত্তরাধিকারী। আর্থিক সংকটের কারণে অধিকাংশ শিল্পী এই পেশা ছেড়ে অন্য কাজে যুক্ত হয়েছেন যেমন – কাঠ মিস্ত্রিগিরি, প্রতিমা তৈরি, দর্জির কাজ, কৃষিশ্রমিক, বা সাধারণ মেরামতির কাজ।[১৫]

**বোকারো জেলার জালা গ্রামের বাস্তব চিত্র :** বোকারো জেলার পিন্ডার জোড়া থানার অন্তর্গত জালা গ্রামে সরেজমিনে সমীক্ষা চালিয়ে পটশিল্প ও পাটুয়া সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। এই গ্রামের একজন প্রবীণ পটশিল্পী ছিলেন তারণী চিত্রকর (বয়স প্রায় ৮৫ বছর), যিনি বর্তমানে প্রয়াত। তাঁর মৃত্যুর পর এখন তাঁর দুই ভাইপো-হরগৌরী চিত্রকর ও গণেশ চিত্রকর-পট নির্মাণ ও পটের গান পরিবেশনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাঁদের কাঁচা বাড়িতে বসবাস করতে হয় এবং চরম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছে (চিত্র ৫)। শুধুমাত্র পটশিল্প ও পটের গান পরিবেশন করে সংসার নির্বাহ করা বর্তমানে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গ্রামে আনুমানিক ১০-১৫টি পাটুয়া পরিবার বসবাস করে, যাঁদের পারিবারিক পদবি ‘চিত্রকর’। গ্রামবাসীদের কাছে তাঁরা ‘পাইটকার’, ‘জাদুপেট্যা’, ‘পেট্যা’ ইত্যাদি নামে পরিচিত। প্রথা অনুযায়ী, গ্রামে কারও মৃত্যু হলে পাটুয়ারা সেই বাড়িতে উপস্থিত হয়ে পট দেখিয়ে ও গান গেয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। হরগৌরী চিত্রকরের বক্তব্য অনুযায়ী, বর্তমান সমাজে লোককথা ও লোকবিশ্বাসের প্রতি মানুষের আস্থা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে তাঁদের যথাযথ আয় হচ্ছে না এবং সংসার চালাতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই পেশার প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। অনেকেই শ্রমিকের কাজ, দর্জি কিংবা ইটভাঁটার কাজে যুক্ত হতে চাইছে। পাশাপাশি, নতুন প্রজন্মের পক্ষে লোককথা ও পটের গান মুখস্থ রাখা বা ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এর ফলে পটশিল্প ও পাটুয়া গীত ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে।[১৬]

**চিত্র ৫:** চিত্রকরদের বর্তমান অবস্থা।

সাঁওতাল সমাজের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে পটুয়ারা পট প্রদর্শন করেন। বাঁধনা, সোহরাই, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে পৃথক পৃথক পট ও সংশ্লিষ্ট গান পরিবেশিত হয়। পাশাপাশি, সমসাময়িক ঘটনাবলীকেও কেন্দ্র করে তারা নতুন পট ও গান রচনা করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের প্রথম ও একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে সাঁওতালি ভাষায় রচিত এমন গানও লক্ষ্য করা যায়।[১৭]

“ভারত আয়ু ইন্দিরা গান্ধী চালাও ইনা।
রাইদা আবু জতগে উনি লাগিত,
ভারত বাংকানা রাজীব সঞ্জয় শুধু আমার হপন।
দিশ মরেন সত্তর কোটি মেনায়া বর্তমান,
জিবেৎ কাতে তাহেন আম তালেরে তালেরে।
আলে তালাতে আলে তালায়ে আলে তালারে।।”[১৮]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 423
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

**অবক্ষয়ের কারণ :** পট শিল্পীদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অধিকাংশই ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আগেকার দিনে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে তারা হাজির হয়ে চক্ষুদান পট দেখিয়ে বেশ টাকা রোজগার করত। কিন্তু আধুনিকতার অভিঘাতে ঝাড়খণ্ডের এই ঐতিহ্য আজ তীব্র সংকটের মুখে। প্রযুক্তিনির্ভর বিনোদন, পৃষ্ঠপোষকতার হ্রাস, সাংস্কৃতিক রুচির পরিবর্তন, শিল্পীদের আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং প্রজন্মান্তরে জ্ঞান হস্তান্তরের ক্ষয় - সবমিলিয়ে পটুয়া শিল্প এখন বিলুপ্তির পথে। অনেক পটুয়া পরিবার জীবিকার চাপে পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হওয়ায় শিল্পের মৌলিকত্ব, সাংস্কৃতিক মূল্য ও সামাজিক সংযোগ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। যদিও এই শিল্পরূপের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক মূল্য অমূল্য, তবুও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সরকারি সহায়তা যথেষ্ট নয়।

**পুনরুজ্জীবন ও সরকারি উদ্যোগ :** পট শিল্পের ভবিষ্যৎ আজ অত্যন্ত অনিশ্চিত ও সংকটাপন্ন। রাজ্য সরকার বা বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগের অভাব দীর্ঘদিন ধরেই এই শিল্পধারাগুলোর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোভিড-১৯ মহামারির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব, যা শিল্পীদের আর্থিক বিপর্যয়কে আরও গভীর করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কতজন সক্রিয় শিল্পী শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে এই শিল্পচর্চা চালিয়ে যেতে পারবেন, তা অনুমান করাও কঠিন। শিল্পীরা যেভাবে আয়ের অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক অবহেলার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, তাতে এই শিল্পরূপ ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পথে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। যাতে এই ঐতিহ্যবাহী চিত্রশিল্প অতীতের নিদর্শনে পরিণত না হয়, তার জন্য -

- সরকারকে শিল্পীদের আর্থিক অনুদান, প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং স্থায়ী বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- বেসরকারি সংস্থা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিল্পীদের পণ্যের বিপণন, প্রদর্শনী এবং অনলাইন বিক্রির সুযোগ বৃদ্ধিতে এগিয়ে আসতে হবে।
- NGO ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে নথিভুক্তকরণ, সংরক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে।
- সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ-স্থানীয় শিল্পীর কাছ থেকে শিল্পকর্ম কেনা এবং তাঁদের উৎসাহ দেওয়া এই শিল্পরূপগুলোকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করবে।

ঝাড়খণ্ডের পটশিল্প ও পটুয়া গীতের সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এই শিল্পরীতি শুধুমাত্র একটি নান্দনিক বা বিনোদনমূলক মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি জটিল সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং দার্শনিক অভিব্যক্তি। পটশিল্পের স্ক্রোল বা পট এখানে একটি 'জীবন্ত পাঠ' হিসেবে কাজ করে, যা কেবল দেখার জন্য নয়, বরং শোনার ও অনুভব করার জন্য নির্মিত। পটুয়ারা যখন পটচিত্র একে একে খুলে ধরেন এবং সেই সঙ্গে গান পরিবেশন করেন, তখন একটি বহুমাত্রিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে— যেখানে দৃশ্য, শব্দ এবং আবেগ মিলিত হয়ে দর্শকের কাছে একটি জীবন্ত অভিজ্ঞতা তৈরি করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পটশিল্পকে একটি পারফরমেটিভ টেক্সট বা 'living text' হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

এই শিল্পরীতির মধ্যে নৈতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক মাত্রাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্ক্রোলের কাহিনিগুলিতে জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের মতো বিষয়গুলি উপজাতীয় মানুষের জীবনদর্শন ও বিশ্বাস ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটায়। এই ধরনের কাহিনি শুধু ধর্মীয় আখ্যান নয়, বরং মানুষের নৈতিকতা, সামাজিক দায়িত্ব এবং জীবনচক্র সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি প্রদান করে। ফলে পটশিল্প একটি সাংস্কৃতিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে।

পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকেও পটশিল্পের একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই শিল্পে ব্যবহৃত রং সাধারণত প্রাকৃতিক উৎস— যেমন গাছের পাতা, মাটি, ফুল এবং খনিজ পদার্থ থেকে প্রস্তুত করা হয়। একই সঙ্গে পটচিত্রে প্রকৃতি-নির্ভর প্রতীক ও চিত্রায়ণ এই শিল্পকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই করে তোলে। বর্তমান বিশ্বে যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেখানে পটশিল্প একটি ঐতিহ্যগত টেকসই শিল্পরূপ হিসেবে নতুনভাবে মূল্যায়িত হতে পারে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, ঝাড়খণ্ডের পটশিল্প ও পটুয়া গীত একটি গতিশীল সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া, যা একদিকে ঐতিহ্যকে ধারণ করে এবং অন্যদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। আধুনিকতার প্রভাবে এই শিল্পরীতি নতুন সুযোগ

ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও, যথাযথ সংরক্ষণ ও নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে এটি ভবিষ্যতেও তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

**উপসংহার :** ঝাড়খণ্ডের পটশিল্প ও পটুয়া গীত কেবলমাত্র একটি শিল্পরীতি নয়, বরং এটি একটি বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন, যা লোকজীবন, বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার, সামাজিক সম্পর্ক এবং ইতিহাসের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে। ঝাড়খণ্ডের গ্রামীণ সমাজে এই শিল্পের উপস্থিতি বহু প্রাচীনকাল থেকে লক্ষণীয়, যেখানে শিল্পীরা তাঁদের সৃজনশীলতা, কল্পনাশক্তি, অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে রঙিন পটের মাধ্যমে জীবন্ত কাহিনি তুলে ধরেন এবং সংগীতের মাধ্যমে সেই কাহিনীগুলিকে শ্রোতাদের কাছে প্রাণবন্ত করে তোলেন। তবে আধুনিকতার প্রবল প্রভাব, প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি এবং বিনোদনের নতুন মাধ্যমের আগ্রাসনে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প আজ অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। বর্তমান প্রজন্ম এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং শিল্পীদের আর্থিক অনিশ্চয়তা তাঁদের পেশা থেকে সরে আসতে বাধ্য করছে। ফলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মৌখিকভাবে সংরক্ষিত শিল্পরীতি আজ বিলুপ্তির মুখে দাঁড়িয়ে। বর্তমান সময়ে পটশিল্প, পটুয়া গীতের সংরক্ষণ ও পুনর্জাগরণ অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে সরকারি শিল্পকলার দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, বেসরকারি উদ্যোগ, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় ভূমিকা এবং স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। শিল্পীদের জন্য আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, প্রদর্শনী ও বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে এই শিল্প নতুন করে প্রাণ ফিরে পেতে পারে। পাশাপাশি শিক্ষার পাঠ্যক্রমে পটশিল্প ও পটুয়াগীত অন্তর্ভুক্ত করা হলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং সংরক্ষণে এগিয়ে আসবে। তাই এই মূল্যবান ঐতিহ্যকে রক্ষা করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রঙিন কাহিনীর জাদুতে মুগ্ধ হতে পারে।

## Reference:

১. Rege Satyamangal, Paitkar Painting of Jharkhand: The Scroll Narratives of Tribal Storytellers-A Summative Study, International Journal of Multidisciplinary Research and Modern Education, Volume 11, Issue 2, July - December, Page Number 105-107, 2025.

২. মাহাত, বঙ্কিম চন্দ্র, ঝাড়খণ্ডের লোক সাহিত্য, পৌষ সংক্রান্তি ১৩৮৪ জানুয়ারী ১৯৭৮, প্রকাশক অবনীদ্রনাথ বেরা ১৪ এ টেমার লেন কলকাতা পৃ. ৩৮

৩. মাহাতো হংসেশ্বর, রায় সুভাষ, মাহাতো চন্দ্র ক্ষীরোদ, মাহাতো কিরীটি, সিং শিব শঙ্কর, মানভূমের লুপ্তপ্রায় লোকগীত, ২০২৫ মানভূম কালচারাল আকাডেমিক তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১৮

৪. বিশ্বাস, দাস প্রকাশ, পটচিত্রকথা সেপ্টেম্বর ২৬, ২০১৫, নন্দিম্রিনাল
https://nandimrinal.wordpress.com/2015/09/26/%e0%a6%aa%e0%a6%9f%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%a5%e0%a6%be/

৫. মণ্ডল, কুমার গৌতম, লোকমন, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১২, কমলেশ নন্দ কর্তৃক রাঙামাটি, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পৃ. ৫৮

৬. রক্ষিত সৌমেন, বাঁকুড়া পটের গান, যামিনী রায় ইনস্টিটিউট অফ আর্ট এন্ড কালচার ৪র্থ ক্যাম্পাস, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, অভিব্যক্তি সংবাদ-২৩

৭. মুখোপাধ্যায়, ড. আদিত্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি,২০০৩, শ্রী অধীর চন্দ্র পাল, অমর ভারতী, ৮ সি ট্যামার লেন, কলকাতা, পৃ. ১২২

৮. মুখোপাধ্যায়, ড. আদিত্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি,২০০৩, শ্রী অধীর চন্দ্র পাল, অমর ভারতী, ৮ সি ট্যামার লেন, কলকাতা, পৃ. ১২০

৯. মণ্ডল, কুমার গৌতম, লোকমন, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১২, কমলেশ নন্দ কর্তৃক রাঙামাটি, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পৃ. ৬২

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 45*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 423*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

১০. পূর্বোক্ত পৃ. ৬৩

১১. পূর্বোক্ত পৃ. ৬১

১২. মাহাত, চন্দ্র বঙ্কিম, ঝাড়খণ্ডের লোক সাহিত্য, পৌষ সংক্রান্তি ১৩৮৪ জানুয়ারী ১৯৭৮, প্রকাশক অবনীন্দ্রনাথ বেরা ১৪ এ টেমার লেন কলকাতা পৃ. ১৭৬

১৩. হেমব্রম পরিমল, ঝাড়খণ্ডের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ-বইমেলা ২০১৮, শ্রী নির্মল কুমার সাহা, সাহিত্যম, ১৮ বি, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ৬২, ৭৬

১৪. মাহাত, চন্দ্র বঙ্কিম, ঝাড়খণ্ডের লোক সাহিত্য, পৌষ সংক্রান্তি ১৩৮৪ জানুয়ারী ১৯৭৮, প্রকাশক অবনীন্দ্রনাথ বেরা ১৪ এ টেমার লেন কলকাতা পৃ. ৪৪-৪৫

১৫. দত্ত, চট্টোপাধ্যায় সুমনা, দুমকার চক্ষু দান পট, এপ্রিল ২০১০, পরবাস পত্রিকা

১৬. সাক্ষাৎকার, গণেশ চিত্রকর, হারাগৌরি চিত্রকর, গ্রামে- জালা, থানা- পিন্ডাজোড়া, জেলা- বোকারো, (ঝাড়খণ্ড)

১৭. মণ্ডল কুমার গৌতম, লোকমন, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১২, কমলেশ নন্দ কর্তৃক রাঙামাটি, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পৃ. ৬৫

১৮. পূর্বোক্ত পৃ. ৬৬